নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(১০)

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন বেলা দুটো বেজে গেছে—রামকৃষ্ণদেবের তবু দেখা নেই। আরতির প্রদীপ কেবল একভাবে ঘিয়ের শিখা দিয়ে মন্দিরকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে—

স্বামীজী

পূজার ফুলগুলো সুবাস গন্ধ ছড়িয়ে রেখেছে, তাদের গা থেকে গঙ্গাজল সব ফোঁটায় ফোঁটায় ভক্তি-অশ্রুর মত তখনও ঝরে পড়ছে। নৈবেদ্যের ক্ষীরের নাড়ুগুলো শালগ্রাম শিলার মত যেন অদূরের আলোচাল গুলোর আলোচনা শুনছে—

বাইরের গেটে সানাইয়ের বাদ্য তখনও মিষ্টিসুরে গেয়ে চলেছে—"মাগো তোর এ কোন্ বিচার! শিব হয়ে তুই থাকিস্ পায়ের তলে, আবার কৃষ্ণ হয়ে নৌকা বেয়ে বেড়াস্ জলে-জলে; বুঝিনা তোর এ কোন্ ব্যবহার—মাগো তোর, এবা কোন্ বিচার!'

অমাবস্যার দিন, কাতারে কাতারে ভক্ত নরনারীগণ হাত জোড় করে বসে আছে—রাণী রাসমণিও সারাদিন উপবাস করে বেলা একটার সময়েই মন্দিরে এসেছেন—পূজার প্রসাদী ফুল না পেলে তিনি কোন পানীয় গ্রহণ করেন না। তিনিও একটু চঞ্চল হয়ে পড়লেন।

মথুরবাবু রাণীমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমার মায়ের ছেলেকে গঙ্গার ঘাটেও পাওয়া গেলনা, গঙ্গার পাটেও না, এ তটেও না—ও তটেও না—কতকগুলো মাঝি শুধু নির্দ্দেশ দিল একটি লোক ডুবে সাঁতার দিতে দিতে, গঙ্গার মাঝ বরাবর এল—কিন্তু পরে আর তাকে দেখা গেল না। আমরা তাড়াতাড়ি নৌকা বেয়ে এখানে এসে এখনও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; কিন্তু এক ঘন্টার ওপর হ'য়ে গেল, লোকটি যে কোথায় অদৃশ্য হল, তার কোন চিহ্নই পাচ্ছি না"—এ কথা শুনিবামাত্র রাণীমা চম্‌কে উঠ্‌লেন। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষুদুটি তাঁর, চাঁদের আলোকে কালো দীঘির মত জ্বলে উঠল—ধীর পদবিক্ষেপে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চললেন—সানাইয়ের বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল— সমবেত ভক্ত নরনারীর চক্ষুগুলিও সজল হয়ে উঠলো।

ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে বিবেকানন্দ ঝড়ের মত সেখানে প্রবেশ করে মথুরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,"ঠাকুর কোথা? মন্দিরের প্রিয় দেবতা কোথায় গেলেন? পূজার মাঝে আমি তাঁকে দেখলুম — 'মা! মা!' বলতে বলতে তিনি গঙ্গাগর্ভে ডুবে যাচ্ছেন! এ কথা কি সত্যি?"

নরেনের কথা শুনে, মথুরবাবু আবেগভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাণী রাসমণি থম্‌কে দাঁড়ালেন — সমবেত ভক্ত নরনারীগণ তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

স্বামীজী তাদের হাবভাব দেখে, নিজের কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়েই যেন আর তাদের উত্তর না শুনেই হন্‌হন্ করে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চললেন। পেছনে দেখা গেল প্রায় একশত নরনারী রাণীমাকে বেষ্টন করে তাঁরই সাথে স্নানের ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে। সবারই মুখে চোখে একটা বিষাদের ছায়া ফুটে উঠেছে।

একটু দূরেই গিরিশকে দেখা গেল, তিনি যেন গিরিচূড়া ভেঙ্গে, ধড়াচূড়া বেঁধে স্বয়ং গিরিধারীর মতোই কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দেবার জন্য ছুটে আসছেন। মুহূর্তের মধ্যেই কিসে কী যে হল—তা যেন বোঝা গেল না—গিরিশ ডুবল; নরেন ডুবল, মথুরবাবু একগলা জলে দাঁড়িয়ে হাবুডুবু খেতে লাগ্‌ল এবং হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে রাণী রাসমণি শুধু চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনার সুরে, করুণ ধ্বনিতে বলে যেতে লাগলেন—"ওগো মা গঙ্গা, ওগো মা সুরধুনী, ওগো মা বিশ্বজননী, তুই ওদের ফিরিয়ে দে মা—ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দে!"

প্রায় একশত জন ভক্ত নরনারী গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে, আকুল ভাবে রাণীমার প্রার্থনা শুনতে শুনতে, তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি নিয়ে বলে যেতে লাগল,"ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।"

কৃষ্ণ যেমন কালিন্দীর কূলে ডুবেছিলেন, শুধু শ্রীদাম, সুদাম ছাড়া আর কেউ যেমন তাঁরই খোঁজে কালিন্দীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি, মা যশোদাও কেবল এক গলা জলে দাঁড়িয়ে শুধু, 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' বলে ডেকেছিলেন, আর শত শত গোপ-গোপিনী কেবল তীরে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল, এখানেও ঠিক সেই দৃশ্যের অবতারণা দেখা গেল।

রাণীমার আকুল প্রার্থনা এবং শত শত ভক্ত নরনারীর করুণ সুর যেন বৈকুণ্ঠে পৌঁছতেই বিষ্ণু-সিংহাসন কেঁপে উঠল, কৃষ্ণের রাধানামের সাধা বাঁশী থেমে গেল, মা বাসুকী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চোখের জল বুকে আসতে যতটুকু সময়

লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই রামকৃষ্ণদেবকে জলের উপর ভেসে উঠতে দেখা গেল। একহাত তাঁর ঊর্দ্ধগামী এবং অন্যহাত তাঁর বক্ষলগ্ন — স্বয়ং নারায়ণ যেন শঙ্খচক্র হাতে ধরার বুকে নেমে এলেন— পায়ের কাছে হাঁটু জল তাঁর সপ্ত সমুদ্রের মতই যেন স্থির হয়ে পড়ে আছে।

রামকৃষ্ণদেব একটু এগিয়ে এসেই নরেনকে জল থেকে তুলে নিলেন, মনে হল যমুনার জল থেকে স্বয়ং বসুদেব যেন কৃষ্ণকে কোলে তুল্‌লেন — আরও একটু এগিয়ে আসতেই দেখা গেল, গিরিশদেবও আপনা আপনি ভেসে উঠছেন — চারিদিকে আনন্দের উৎসব ছড়িয়ে গেল। দেউড়িতে সানাইয়ের সুর বেজে উঠল—

আয় মা, যশোদা, ঘরে ফিরে আয়,
কৃষ্ণ কোলে নিয়ে, ঘরে ঘরে দে,
রামকৃষ্ণ নাম, গান গেয়ে যাই
মন্দিরে তারে, দেমা এনে দে! ....**ক্রমশঃ**